পঞ্চম অধ্যায়

অবনীন্দ্রনাথের সাহিত্যের চিত্রধর্মীতায় লোকায়ত চেতনা

অবনীন্দ্রনাথ একাধারে ছিলেন চিত্রকর ও সাহিত্যিক। তাই তাঁর রচনার মধ্যে এই দুই এর মিশেল লক্ষ্য করা যায়। শিল্পী মানুষরা স্বভাবতই ভাবুক হন। আর সেই ভাবই তাদেরকে নিয়ে সৃষ্টি করিয়ে নেয়। ছবির মধ্য দিয়ে যখন তিনি মনের ভাব সম্পূর্ণ করে ধরে দিতে পারতেন না, তখনই তা প্রকাশ পেত লেখনির মধ্য দিয়ে। তাই তাঁর রচিত সাহিত্য পড়তে গেলে চোখের সামনে ভেসে ওঠে একের পর এক ছবি। তাঁর সাহিত্য যেন কলমের আঁচড়ে ফুটে ওঠা ছবি। ছবি ও লেখার এমন সামঞ্জস্য বিধান বাংলা সাহিত্যে খুব কমই চোখে পড়ে। তিনি 'বুড়ো আংলা' তে বলেছেন —

'' 'কোন গ্রাম?' 'তঁতুলিয়া, সাবেক তেঁতুলিয়া।' 'কোন শহর?' 'নোয়াখালি - খটখটে।' 'কোন মাঠ?' 'তিরপুরনীর মাঠ - জলে থৈ থৈ।' ... 'কার বাড়ি?' 'ঠাকুর বাড়ি।' 'কোন ঠাকুর?' 'ওবিন ঠাকুর - ছবি লেখে।' ''[১]

তিনি ছবি যে আঁকতেন না, লিখতেন তা রসিকতার ছলে আমাদের জানাচ্ছেন। তাঁর লেখাগুলো পড়লেও মনে হয় ওগুলো লেখা গল্প না, বলা গল্প। পড়তে পড়তে মনে হয় কেউ যেন সামনে বসে আলাপচারিতার ঢঙে কথা বলে চলেছেন। অবনীন্দ্রনাথের সাহিত্যে এমন ছবির দেখা সর্বত্রই মেলে। রসের তুলি দিয়ে যেমন তিনি ছবি এঁকেছেন, আবার সেই রসে তাঁর লেখনী ডুবিয়ে তিনি কথার ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন।

ঠাকুরবাড়ি তৎকালীন সময়ে সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতিতে যেমন অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে, তেমনি স্বদেশের কল্যাণের জন্যও তাঁরা সমান ভাবে সামিল হয়েছে। ঠাকুর বাড়িতে স্বদেশী আনার হাওয়াও বইত। সেই পরিবেশেই মানুষ অবনীন্দ্রনাথ। তিনি স্বদেশের বিভিন্ন কাজে ঝাঁপিয়েছেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে। স্বদেশী ভাণ্ডার খুলেছিলেন, রাখীবন্ধন উৎসবে সামিল হয়েছিলেন, বাংলা ভাষার জন্য গলা ফাটিয়ে ছিলেন। উচ্চ পরিবারে জন্মানো সত্ত্বেও তাঁর চোখ মাটির থেকে কখনো সরে যায় নি। সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনার তিনি অংশীদার হয়েছেন। মানুষের উপকারে হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। এই বোধই তাঁকে দেশীয় শিল্প-সংস্কৃতির দিকে আগ্রহী করে তুলেছিল। দেশের লোকসমাজ ও লোক সংস্কৃতির প্রতি তিনি ছিলেন শ্রদ্ধাশীল। প্রাচীন ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। তাই তাঁর রচনায় দেখা যায় গ্রাম বাংলার নানান চিত্র। কোথাও জেলে মাছ ধরে চলেছে, নৌকা ভেসে যাচ্ছে নদীতে, কোথায় মাতা খড়ে ছাওয়া মাটির ঘরে বসে অপেক্ষা করেছে সন্তানের জন্য। এমনি নানা লোকায়ত ছবি তাঁর সাহিত্যে ফুটে উঠতে দেখা যায়। তাছাড়া অবনীন্দ্রনাথ তাঁর বিভিন্ন রচনায়

লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতির নানা উপাদান ব্যবহার করেছিলেন। তাই তাঁর সাহিত্যের চিত্রধর্মীতায় লোকায়ত চেতনা ফুটে ওঠাই স্বাভাবিক। অবনীন্দ্রনাথের সাহিত্যের চিত্রধর্মীতায় লোকায়ত চেতনার খোঁজ আমরা যেসব রচনায় পাব তা তুলে ধরব।

অবনীন্দ্রনাথ এর 'রাজকাহিনী' গ্রন্থটি অনেকগুলি গল্প নিয়ে রচিত। তার মধ্যে একটি গল্প 'রানা কুম্ভ'। কুম্ভের বাবা মুকুলের দুই খুড়ো ছিল - চাচা ও মৈর। তাদের মাকে নিয়ে মুকুল একবার অপমানজনক কথা বলায় ঐ দুই খুড়ো রাস্তা থেকে কুড়িয়ে আনা মেয়েকে নিয়ে পল্লীগ্রাম থেকে একটু দূরে পাহাড়ের উপরে রাতকোটের কেল্লায় চলে যনা। তারপর রাত্রে সেই ভাঙা কেল্লায় বসে দুই খুড়ো তাদের সেই কুড়োনো মেয়েটিকে গল্প বলে চলে —

''এদিকে সেই আঁধার ঘরের একটি পিদিম বাতাসে নিবু-নিবু করছে; তাকেই ঘিরে তিনটি প্রাণী। বুড়ো চাচা গল্প বলছেন, তাঁর ছোট ভাই আর এক বুড়ো ছেঁড়া কাঁথায় বসে ঝিমোচ্ছেন, আর একটি মেয়ে অবাক হয়ে শুনছে। আমরা দুই ভাই তখন খুব ছোটো। আমি চলতে শিখেছি আর ও তখন মায়ের কোলে কোলেই ফিরে। মা আমার হাত ধরে চললেন — এতটুকু ওকে বুকে করে। ... তারপর আমরা ঘর ছেড়ে বার হলুম। আমাদের সেই ছোটো ঘরখানি সেই সবুজ মাঠের ধারে সেই মস্ত তেঁতুলতলার দিকে চেয়ে আমার মনটা কেমন কেমন করতে থাকল। আমি কেবলি ঘরের দিকে ফিরে চলতে চাইলেম। মা কিন্তু আর সেদিকেও চাইলেন না - সোজা চললেন আকাশ যেখানে মাটিতে এসে মিশেছে বরাবর সেই দিকেই চেয়ে। সন্ধ্যা হলে পথের ধারে, কোনো দিন গাছতলায় কোনো দিন খোলা মাঠে মা আমাদের নিয়ে রাত কাটান। সকালে আবার চলতে আরম্ভ করেন। দুপুরে কোনো দিন কোনো গাঁয়ে আমি, সেখানে যা ভিক্ষে পাই, তাই খাই। কোনোদিন কিছু পাইও না, খাইও না। ... শীত এল মাঠের দুরন্ত বাতাস রাতের বেলায় গায়ে যেন বরফ ঢেলে দিতে লাগল। ছেঁড়া কাঁথায় আমাদের জড়িয়ে নিয়ে মা সারারাত কাঁদতেন আর জাগতেন।''[১]

পড়তে পড়তে চোখের সামনে ভেসে ওঠে অজস্র ছবি। গ্রামের পরিবেশ, দুখিনী মা, ছেঁড়া কাঁথা সব মিলিয়ে অবনীন্দ্রনাথ এখানে লোকায়ত চিত্রই ফুটিয়ে তোলেন। 'রাজকাহিনী'র অপর একটি গল্পে 'সংগ্রামসিংহ'-তেও লোকায়ত চিত্রের আভাস মেলে —

''চারণী মন্দির থেকে প্রায় এক রাতের পথ রাঠোর সর্দার 'বিদা'র কেল্লার বুরুজের ধরনে কাঁচামাটির দেওয়াল ঘেরা খামার বাড়ি। ভোর হয়ে আসছে কিন্তু মেঘে-ঢাকা আকাশে তখনো আলোর টান একটিও পড়েনি। উঠোনের মাঝে মস্ত তেঁতুল গাছটার আগায় পোষা ময়ূরটা ডানায় মুখ গুঁজে চুপ করে আছে। গাছের তলায় হালের গরু দুটো মাটিতে পড়ে আরামে ঝিমোচ্ছে। কোথাও কোনো শব্দ নেই।''[২]

'ভূতপতরীর দেশ' অবনীন্দ্রনাথের এক কিম্ভূত রসের গল্প। যেখানে গল্পের কথক মাসির বাড়িতে মোয়া খেয়ে পালকিতে শুয়ে পিসির বাড়ি চলেছে। গল্পে রয়েছে তিনটি অংশ। গল্পের 'হারুন্দের কথা' অংশে হারুন্দা ও তার চাকর মসুর এর হিন্দুস্থানের দিকে বাণিজ্য করতে যাওয়ার ঘটনা আছে। আর সেই যাত্রাপথেই এসেছে নানা ছবি। মসুর হারুন্দেকে বলেছে —

''হুজুর, ওর ওপর একবার নৌকায় করে হাওয়া খেয়ে দেখুন, দিল্ খুশ হয়ে যাবে। ওই নদীর ধারে আমার বাড়ি দেখা যায়, ওই আখের খেতের ধারে হুজুর। ওই আমাদের বুড়ো গাধাটি আমার দিকে মুখ তুলে চেয়ে আছে হুজুর। আমি হিন্দুস্থানের হীরে-জহরতের খোঁজে যেতে চাইনে, আমাকে আমার দেশের এই আখের খেতে ছেড়ে দিয়ে যান হুজুর।''[৩]

'নালক' গৌতম বুদ্ধকে নিয়ে লেখা একটি গল্প। বর্ধনের বনে ঋষি শিষ্য নালককে রেখে কপিলাবস্তুতে চলেছেন বুদ্ধদেবকে দর্শন করতে। একাকী নালক বনের মধ্যে ধ্যানে বসে দেখতে লাগল একটির পর একটি দৃশ্য। হঠাৎ মা এসে তার ধ্যান ভাঙিয়ে তাকে পড়াশুনোর জন্য গ্রামে নিয়ে চলে যায়। কিন্তু গ্রামে নালকের মন টিকেনা। তার মন পড়ে থাকে সেই বর্ধনের বনে। নালক ভাবতে থাকে নানান ভাবনা —

''পাঠশালের খোড়ো-ঘরের জানলা দিয়ে একাট তিন্তিড়ী গাছ, খানিকটা কাশ আর কাঁটাবন, একটা বাঁশঝাড় আর একটি পুকুর দেখা যায়। দুপুরবেলা একটুখানি রোদ সেখানে এসে পড়ে, একটা লালঝুঁটি কুবোপাখি ঝুপ করে ডাকতে থাকে, কাঁটাগাছের ফুলের উপরে একটা কালো ভোমরা ভন্ ভন্ করে উড়ে বেড়ায় — একবার জানালার কাছে আসে আবার উড়ে যায়। ... নালক পাঠশালা থেকে মায়ের হাত ধরে যখন বাড়ি ফেরে, হয়তো শালগাছের উপরে তালগাছগুলোর মাথা দুলিয়ে পুবে-হাওয়া বইতে থাকে, বাঁশঝাড়ে কাকগুলো ভয়ে কা-কা করে ডেকে ওঠে। নালক মনে-মনে ভাবে আজ যদি একম একটা ঝড় ওঠে যে আমাদের গ্রামখানা ঐ পাঠশালার খোড়ো চালটা সুদ্ধ একেবারে ভেঙে-চুরে উড়িয়ে নিয়ে যায় তবে বনে গিয়ে আমাদের থাকতেই হয়, ... নালক ততই মনে-মনে ডাকতে থাকে — ঝড় আসুক, আসুক বৃষ্টি। মাটির দেওয়াল গলে যাক, কপাটের খিল ভেঙে যাক।''[৪]

ছবির পর ছবি সাজিয়ে দিয়েছেন অবনীন্দ্রনাথ। আর সেখানে এসেছে খোড়ো ঘর, খোড়ো চাল, মাটির দেওয়াল প্রভৃতি লোকায়ত উপাদান।

সিদ্ধার্থ ক্রমে বড়ো হয়ে উঠেছে। রাজা শুদ্ধোধন আনন্দ-আহ্লাদ দিয়ে সিদ্ধার্থকে ভুলিয়ে রাখেন, পাছে না সে সংসার পরিত্যাগ করে। জগতের সকলের দুঃখ নিবারণ যাঁর জীবনের ব্রত, তাঁকে কী খেলনা দিয়ে ভুলিয়ে রাখা যায়। তাই থেকে থেকে সিদ্ধার্থের মনোরথ নানা দিকে এগিয়ে চলে —

''আর একদিন সিদ্ধার্থের সে মনোরথ - সিদ্ধার্থের সোনার রথ মৃদুমন্দ বাতাসে, ধ্বজা পতাকা উড়িয়ে দিয়ে কপিলাবস্তুর দক্ষিণ দুয়ার দিয়ে আস্তে আস্তে বার হয়েছে। ... কত দূরের মাঠে মাঠে রাখাল ছেলের বাঁশির সুর, কত দূরের বনের বনে বনে পাপিয়ার পিউগান সেই বাতাসে ভেসে আসছে কানের কাছে, প্রাণের কাছে! ... মনোরথ আজ ভেসে চলেছে, নেচে চলেছে — সারি-গানের তালে-তালে সুখ-সাগরের থির জলে।''[৫]

এমন করে সুখের স্বপনে ভাসতে ভাসতে হঠাৎ সিদ্ধার্থের চোখের সামনে ধরা দিল জর্জর, রোগে কাতর এক কঙ্কাল মূর্তি। তার চোখ দিয়ে যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে আগুন, সে যেন শুষে নিতে চায় পৃথিবীর সমস্ত প্রাণকে। সিদ্ধার্থ দেখলেন, সংসারের কোথাও আলো নেই, শুধুই অন্ধকার। সিদ্ধার্থের মন এসব দেখে আবার সুখ-সাগরে ডুব দিয়েছে। তিনি দেখছেন সবাই যেন আবার গৃহে ফিরে আসছে —

''... সেদিন থেকে সবাই মুখ ফিরিয়ে চলে আসছে নিজের নিজের ঘরের দিকে। পাখিরা ফিরে আসছে নিজের বাসায় - গাছের ডালে, পাতার আড়ালে। ... রাখাল ছেলেরা ফিরে আসছে গাঁয়ের পথে বেণু বাজিয়ে মাটির ঘরে মায়ের কোলে। সবাই ফিরে আসছে ভিন্ গাঁয়ের হাট সেরে দূর পাটনে বিকিকিনির পরে। সবাই ঘরে ফিরে আসছে — যারা দূরে ছিল তারা, যারা কাছে ছিল তারাও। ঘরের মাথায় আকাশ পিদিম, যাদের ঘর নেই দুয়োর নেই তাদের আলো ধরেছে। তুলসী তলায় দুগ্‌গো পিদিম্ — যারা কাছে ছিল, কর্মে ছিল, যারা পড়া পড়ছিল, খেলা খেলছিল, তাদের জন্য আলো ধরেছ। ... ভিখারী যে সেও আজ মনের আনন্দে একতারায় আগমনী বাজিয়ে গেয়ে চলেছে 'এল মা উমা ঘরে এল মা।' মিলনের শাঁখ ঘরে-ঘরে বেজে উঠেছে। আগমনীর সুর, ফিরে আসার সুর, বুকে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ার সুর, কোলে এসে গলা ধরার সুর, আকাশ দিয়ে ছুটে আসছে, খোলা দুয়ারে উঁকি মারছে, খালি ঘরে সাড়া দিচ্ছে।''[৬]

সিদ্ধার্থ সন্তানের পিতা হলেন। শুদ্ধোদন ভাবলেন পুত্র রাহুলের মুখ চেয়ে হয়তো সিদ্ধার্থ সংসারের মায়ার বাঁধা পড়বেন। কিন্তু কোথায় আর বাঁধা পড়লেন। পুত্র স্ত্রীকে রেখে কণ্ঠক ঘোড়ায় চেপে সিদ্ধার্থ এগিয়ে চললেন অনামা নদী পার হয়ে —

''ছোটো নদী দেখতে এতটুকু, নামটির তা নমা; কেউ বলে অনামা, কেউ বলে অনোমা, কেউ বা ডাকে অনমা। সিদ্ধার্থ নদীর যে পারে নামলেন সে পারে ভাঙন জমি — সেখানে ঘাট নেই, কেবল পাথর আর কাঁটা। আর যে পারে সিদ্ধার্থ উঠলেন সে পারে ঘাটের পথ ঢালু হয়ে একেবারে জলের ধারে নেমে এসেছে। গাছে গাছে ছায়া করা পথ। সবুজ ঘাস বনের ফুল দিয়ে সাজানো বনপথ। এই দুই পারের মাঝে নমা নদীর জল-বালি ধুয়ে ঝিরঝির করে বহে চলেছে। একটা জেলে ছোটে একখানি

জাল নিয়ে মাছ ধরছে। সিদ্ধার্থ নিজের গায়ের সোনার চাদর সেই জেলেকে দিয়ে তার ছেঁড়া কাঁথাখানি নিজে পরে চলেছেন।''[৭]

নদী পেরিয়ে সিদ্ধার্থ চলেছেন নগরের দিকে। রাত ফুরিয়ে ভোর হতেই নগরে তিনি 'ভিক্ষা দাও' বলে এসে দাঁড়ালেন। সবাই উজাড় করে দিল তাকে। শেষে নগর পেরিয়ে অঞ্জনা নদীর তীরে উরাইল বনে হাজির হলেন তিনি, বসলেন তপস্যায় দুঃখের শেষ কোথায় তা জানতে। কঠিন তপস্যায় তাঁর শরীর শুকনো গাছের মতো হয়ে গেল। কিছুদিন পরে তিনি তপস্যা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, কিন্তু সন্ধান পেলেন না তার প্রশ্নের। শেষে অঞ্জনা নদীর ধারে বটগাছের তলায় ঠাণ্ডা পাথরে বেদীর উপর তিনি আশ্রয় নিলেন। সেখানেই পুজো দিতে আসে সুজাতার কুড়ানো মেয়ে পুন্না। সে মাঝে মাঝে দূর থেকে দেখতে পায় সন্ন্যাসীকে। আর সুজাতা তা শুনে পুন্নার হাত দিয়ে সেই দেবতার উদ্দেশ্যে পূজার অর্ঘ্য পাঠিয়ে দিলেন। অবনীন্দ্রনাথ বর্ণনা করেছেন —

''আজ বছরের শেষ; কাল নতুন বছরের পূর্ণিমা। পুন্না আজ সকাল করে পাঁচটি পিদিম, পাঁচটি ফল থালায় সাজিয়ে একটি নিজের নামে, একটি ভায়ের নামে, একটি মায়ের নামে, একটি বাবার নামে, একটি মোড়ল দাদার নামে সেই বটগাছের তলায় সাজিয়ে রাখছে। ... ওপারে দেখা যাচ্ছে ধানের ক্ষেত, আর মাঝে মাঝে আম-কাঁঠালের বাগান ঘেরা ছোটো-ছোটো গ্রামগুলি মাটির ঘর, খড়ের চাল, একটা পাড়াড় — সে কত দূরে দেখা যাচ্ছে মেঘের মতো। নদীর ওপারেই মেঠো রাস্তা - সবুজ শাড়ির সাদা পাড়ের মতো সরু, সোজা। সেই রাস্তায় চাষার মেয়েরা চলেছে ঘাসের বোঝা মাথায় নিয়ে। ... পুন্না দেখছে, বেলা পড়ে এসেছে। বালির উপর দিয়ে চলে আসছে অনেকগুলো কালো মোষ, একটার পিঠে মস্ত এক গাছ, লাঠি হাতে বসে রয়েছে গোয়ালাদের ছেলেটা। সে রোজ সন্ধ্যাবেলা মোষে পিঠে চড়িয়ে পুন্নাকে মোড়লদের বাড়ি পৌঁছে দেয়। আজও তাই আসছে।''[৮]

শেষে সিদ্ধার্থ আবার তপস্যায় বসলেন দুঃখের শেষ কোথায় তা জানার জন্যে। রাত্রিতে 'মার' এল তার রুদ্র মুর্তি নিয়ে সিদ্ধার্থের তপস্যা ভঙ্গ করতে। কিন্তু পারল না। 'মার' কে জয় করে তিনি আজ সিদ্ধ হলেন, বুদ্ধ হলেন জগৎ সংসারের মানুষকে অভয় দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। গল্পের শেষের দিকে নালক তার মাকে দেখার জন্য গ্রামে ফিরে যেতে চাইছে। মন তার আর তপোবনে টিকছে না। নালক বেরিয়ে পড়ল —

''বর্ষাকালের একটানা নদী আজ সারাদিন ধরে নালকের মনটিকে টানছে — সেই বর্ধনের বনের ধারে, তাদের সেই গাঁয়ের দিকে। সেই তেঁতুল গাছের ছায়া করা মাটির ঘরে তার মায়ের কাছে নালকের মন একেবারে ছুটে যাচ্ছে, আবার ফিরে আসছে। মন তার যেতে চাচ্ছে মায়ের কাছে, কিন্তু

ঋষিকে একলা রেখে আবার যেতেও মন সরছে না। সেই ওই বকটার মতো কেবলি যাচ্ছে আর আসছে, আসছে আর যাচ্ছে।''[৯]

এইভাবে গল্পের স্থানে স্থানে অবনীন্দ্রনাথ যে সকল ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন, তাতে লোকায়ত ভাবনা এসে মিশেছে। কখনো খোড়ো চাল, মাটির দেওয়াল, নৌকায় ভেসে যাওয়া, রাখালের বাঁশির সুর এমন নানান চিত্র তিনি তুলে ধরেছেন। যা তাঁর লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগকেই তুলে ধরে।

অবনীন্দ্রনাথের শরীর মাঝে একবার ভেঙে পড়ায় ডাক্তার তাঁকে হাওয়া বদল করার পরামর্শ দেয়। সেই সময় স্টিমারে করে বন্ধু অবিনাশ গাঙ্গুলীকে সাথে নিয়ে রোজ গঙ্গার উপর ঘুরে বেড়াতেন। সেখানে চলত নানা গল্পগুজব। সেগুলি তিনি প্রতিদিন ডায়েরিতে লিখতে শুরু করেন। আর এই কাহিনগুলি পরে 'পথে বিপথে' নাম দিয়ে গ্রন্থাকারে প্রকাশ পায়। এই গল্পে মোট বারোটি ঘটনার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। সেই বর্ণনায় উঠে এসেছে গঙ্গা সহ তার আশেপাশের নানা ছবি। তেমনি একটি অংশের নাম 'গমনাগমন'। যেখানে তিনি কোনার্কের মন্দির দেখতে চলেছেন পালকি করে। আর সেই যাত্রাপথের বর্ণনায় তিনি তুলে ধরেছেন ছবির পর ছবি —

''বালুঘাই পার হইয়া চলিয়াছি। পহর রাতি পান-বিড়িটি এবং লণ্ঠনের বাতি, তিনে মিলিয়া মনকে ঘিরিয়া একটা যেন স্বপ্নের সৃজন করিয়াছে। মাঝে মাঝে এক একটা তালগাছ অন্ধকারের ভিতর দিয়া হঠাৎ চোখে পড়িয়া আবার কোথায় লুকাইয়া যাইতেছে। চারিদিকে যেন একটা লুকোচুরির খেলা চলিতেছে। ... পালকি হইতে মুখ বাড়াইয়া দেখি, অদূরে, অন্ধকার বনের ছায়ায় ছোটো গ্রামখানি। মন এখান হইতে; এই চির পরিচিত গৃহকোণকে ছাড়িয়া, এই নিড়াখিয়ার খেয়া ঘাট পার হইয়া আর চলিতে চাহে না।''[১০]

অবনীন্দ্রনাথ জীবনের শেষের দিকে বছর দশেক ছবি আঁকেন নি। সেই সময় তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন যাত্রাপালা লিখতে। তাই কথামালা, পঞ্চতন্ত্র, রামায়ণ এর কাহিনী অবলম্বনে তিনি একাধিক যাত্রাপালা লেখেন। রামায়ণ অবলম্বনে তিনি একটি যাত্রাপালা লেখেন, যার নাম দেন 'খুদ্দুর যাত্রা'। এখানে কাহিনীর সঙ্গে সাযুজ্য রেখে তার পাশে নানা ছবি সেঁটে দিতেন। এর ফলে কাজটি হয়েছিল খুব চিত্তাকর্ষক। এই রচনাটি তাঁর সৃজনী প্রতিভার অমূল্য নিদর্শন। রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাকে নিয়ে পিতৃসত্য পালনের জন্য চলেছেন বনবাসে। পঞ্চবটী বন দিয়ে যেতে যেতে তাঁরা পৌঁছান গঙ্গার তীরে। সেখানে খেয়াঘাটের মাঝি কৈবর্ত্তকে বলেন তাদের পার করে দেবার জন্য। তখন কৈবর্ত্ত সব শুনে রামকে বনে যেতে নিষেধ করেন এবং তাদের জন্য সে এই গঙ্গার ধারেই বাসা বানিয়ে দেবার কথা দেন —

''এই গঙ্গার পারে বাঁধি দিব ঘর চালে দিব ছেয়ে খড়, ওহে রঘুবর বনে দুঃখ পাবেন কেন মা জানকী সাজায়ে দিব পরিপাটি নিকোন চুকন আংলাটি, আম কাঁঠালের বাগানখানি নদী চরের পর - নদী পার বাসী মোরা রবো সহচর।''[১১]

খড়ের চালের ঘর, আম-কাঁঠালের বাগান সব মিলিয়ে যেন এক সুন্দর গ্রামের ছবি আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। রামচন্দ্র নদী পেরিয়ে এসে পঞ্চবটী বনের সৌন্দর্য দেখে মোহিত হয়ে পড়েন। আর লতাপাতার ঘর তৈরী করে এখানেই বাসা বাঁধবে মনস্থির করেন। এই অংশেও ফুটে উঠেছে লোকায়ত চিত্র —

''।। খুদিরাম।। শ্রীরাম বলেন হেথা বাঁধো বাসাঘর ঃ জানকীর মনোমত করিয়া সুন্দর। একদিনে লক্ষ্মণ সে অতি মনোহর, রাম সীতার তরে বাঁধেন বাসাঘর।

।। কেনারাম।। পূর্ণ কুম্ভ দ্বারেতে বনফুল রাশি রাশি অগ্নি পূজা করিয়া রাম-সীতা হলেন গৃহবাসী! লতাপাতা নির্ম্মিত সে কুটীর পাইয়া অযোধ্যার অট্টালিকা গেলেন ভুলিয়া।

।। জুড়ি দোহার গীত।। লতাপাতার ঘরখানি ছোট নদীর বাঁধে, চিক্‌চিক্ জলটুকু ঝিক্‌মিক্ বালি চর, কাশ বনে গাঙশালিক গান ধরে কিচ্‌কিচ্, আকাশপারে কাপাশ মেঘ দেখা দেয় থাকে, ফুল ঝরে ছায়াতলে টুটুন পাখি বাসার কাছে।''[১২]

আবার রাম ও মকরাক্ষের যুদ্ধ যেখানে দেখানো হয়েছে, সেখানেও এসেছে লোক উপাদানের নানা বিষয়। রামের পবন বাণে যখন সব কিছু উড়ে চলেছে, তখন শুরু হয়েছে রাক্ষসদের নৃত্যগীত —

''।। নৃত্যগীত রাক্ষসদের।। আরে ভাই উত্তর হতে ঝড় এসেছে গরু যাচ্ছে উড়ে,
তার পাছে জাবের গামলা গৈলের চাল ফুড়ে।
বাসরে বাস কী বাতাস সর্ব্বনাশ তীর বাতাস, চিতিয়ে
পলো আকাশের চাঁদ গরুর শিং যেন গেল বেঁকে চুরে!
ও উড়ে যায় যে গরুর গাড়ি তার পাছে পাঁচল বাড়ি
উড়তে গিয়ে পড়ছি খালি খালি ঘুরে।
বাতাসের কী ঠেলা বাসরে বাস, এরি নাম বায়ব্যবাণ
এরেই বলে বীর বাতাস পিঠের চাম গেল খুলে।
হায় গোঁসাই কি করি কোথায় যাই এমন বিপাকে
কভু ঠেকি নাই উড়ে গেল চাল ভেঙে পল কুঁড়ে।

কে জানে লঙ্কাপুরী হতে উড়ে পালম এখানে কত দূরে!
চল দেখি মকরাক্ষ প'লো কোথায় মাথা ঘুরে।''[১৩]

অবনীন্দ্রনাথের 'আলোর ফুলকি' মুরগিদের নিয়ে লেখা গল্প। পাহাড়তলির রাজবাহারুদর কুঁকড়ো। তরা চার চারটে বউ থাকা সত্ত্বেও তার মনে সুখ নেই। সে বিশ্বাস করে তার ডাকেই অন্ধকার কেটে পাহাড়তলিতে দিনের আলো ফুঠে উঠে। সূর্যদেব দেখা দেন। তাই রাতের শেষ প্রহর থেকেই সে গলা ছেড়ে ডাকতে শুরু করে। সেই ডাক গোটা পাহাড়ে ধ্বনিত হয়ে বেড়ায়। কিন্তু কোন গুণে কুঁকড়ো এত সন্দুর গান গায়, তা তার চার স্ত্রী জানতে চায়। কুঁকড়ো তাদেরকে সে কথা জানায় না। অপেক্ষা করতে থাকে সেই দিনের জন্য যেদিন তার মনের মতো কেউ তার কাছে এসে ধরা দেবে, আর তাকে সে খুলে বলবে তার সেই গোপন কথা। আবার সে কথা না বলতে পেরে তার বুক ফেটে গেলেও মনের কথা সে মনেই রেখে দেয় —

''মনে মনে এই তর্ক বিতর্ক করতে করতে বুক ফুলিয়ে কুঁকড়ো ধানের মরাইটার চারিদিকে পাচালি করছেন, আর এক-একবার নিজের দিকে ঘাড় বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে নিজেকে নিজে তারিফ করছেন, ক্যা খপ্ সু-র তি ই-ই। তাঁর মাথার মোরগফুলটা আর চোখের কোল থেকে ঝুলছে যে দাড়ি, তার মেহেদি রংটা যে বনের টিয়া থেকে আরম্ভ করে লাল তুতির লালকেও হার মানিয়েছে, এটা কুঁকড়োকে বুঝিয়ে দিতে হল না। তিনি খড়ের গাদার উপরে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে আকাশের পানে একবার, মাঠের দিকে একবার, তাকিয়ে দেখলেন, সোনা আর মানিকের আভায় জল স্থল আকাশ রাঙিয়ে সন্ধ্যাটি কী চমৎকার সাজেই সেজে এসেছে। 'আজকের মতো দিনের শেষ কাজ সাঁঝি আলপনা দেওয়া হল, আজ করবার যা, তা সারা হয়েছে, কালকের চিন্তা কাল হবে, এখন আর কী, দুমুঠো যা জোটে, খেয়ে নিতে ছু-টি-ই-ই।' বলেই কুঁকড়ো একটিবার ডাক দিয়ে চালা ঘরের মটকা থেকে নেমে বাসার দিকে দৌড়ে যাবেন, ওদিক থেকে শব্দ এল, 'রও-ও-ও!' উঠানের মধ্যে শুকনো ঘাসের বোঝাটা একবার খসখস করে উঠল, আর তার তলা থেকে জিম্মা কুত্তানী আর কুটোয় ঝাঁকড়া মাথাটা বের করে জুলজুল করে কুঁকড়োর দিকে চাইতে লাগল।''[১৪]

আলোচ্য অংশটিতে আমরা ধানের মরাই, খড়ের গাদা, আলপনা, চাল ঘরের মটকা প্রভৃতি নানা লোক উপাদানের ব্যবহার দেখতে পেলাম। অবনীন্দ্রনাথ এভাবেই তাঁর বিভিন্ন গল্পের চিত্রধর্মীতায় লোকউপাদানের বার বার সুচারু ভাবে প্রয়োগ করেছেন।

এই ঘটনার কিছু পরেই শিকারীদের তাড়া খেয়ে সোনালিয়া বনমুরগি এসে পড়ল কুঁকড়োর পাহাড়তলির বাসার উপর। কুঁকড়ো তার রূপ দেখে অবাক বেনে গেল। ভাব হয়ে গেল খুব সোনালির

সাথে। কুঁকড়োর মনে হল এতদিনে সে এক মনের মানুষ পেল, যাকে ভরসা করে কিছু বলা যায়। যার কাছে উজাড় করে দেওয়া যায় মনের গভীর যন্ত্রণা। তারপর কুঁকড়ো সোনালিয়াকে তাদের গোলাবাড়ির চারিদিক ঘুরে ঘুরে দেখাতে লাগল —

''কুঁকড়ো খানিক চুপ করে থেকে বললেন, 'একবার গোলাবাড়ির চারিদিক দেখে আসবেন চলুন।' বলে তিনি সোনালিয়াকে খুব খাতির করে সব দেখাতে লাগলেন। প্রথমেই, যেটা থেকে অজ্ঞান হয়ে পড়লে সোনালিয়ার মুখে চোখে জল ছিটিয়ে কুঁকড়ো তাকে বাঁচিয়ে ছিলেন সেই টিনের গামলাটা আর যে কাঠের বাক্সটায় সোনালিয়াকে লুকিয়ে রেখে তম্মার চোখে ধুলো দিয়ে ছিলেন সেই দুটো জিনিস দেখিয়ে বললেন, 'এগুলো নতুন কিনা, কাজেই কুচ্ছিৎ; কিন্তু পুরোনো দেয়াল, ভাঙা বেড়া, ফাটা দরজা, পুরোনো ওই মুরগির ঘরটি আর কতকালের ওই লাঙল, ধানের মরাই আর ওই শেওলায় সবুজ খিড়কির দুয়োর আর পানা পুকুর আর ওই কুঞ্জলতার থোকা-থোকা ফুল, কী সুন্দর এগুলি।''[১৫]

গোলাবাড়ির চারিদিক ঘুরতে ঘুরতে সোনালিয়া কুঁকড়োকে বলল এতটুকু জায়গা ছেড়ে তার বড়ো পৃথিবীটাকে দেখতে কোনোদিন ইচ্ছে করে না। একঘেঁয়েমি লাগেনা একই জায়গায় থাকতে থাকতে। তার উত্তরে কুঁকড়ো তাকে জানায় সে আলোর গুণে তার এই ছোট জায়গাটিকেই প্রতিদিন নতুন নতুন ভাবে আবিষ্কার করে। আলোর গুণে তা কীভাবে সম্ভবপর হয় সোনালিয়া তা কুঁকড়োর কাছে জানতে চাইলে কুঁকড়ো তা বলে চলল —

'' 'দেখো।' বলে কুঁকড়ো একটি স্থলপদ্মের গাছ দেখিয়ে বললেন, 'দিনের আলোর সঙ্গে এই ফুলের রং ফিকে থেকে গাঢ় লাল হবে দেখবে। এই খড়ের কুটিগুলো আর এই লাঙলের ফলাটা আলো পেয়ে দেখো কত রকমই রং ধরছে। ওই কোণে মইখানার দিকে চেয়ে দেখো ঠিক মনে হচ্ছে নাকি এটা যেমন দাঁড়িয়ে ঘুমচ্ছে আর ধানখেতের স্বপ্ন দেখছে। আর মানুষ যেমন পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে, ঠিক তেমনি করে এই পিঁপড়েগুলো দেখো এই চিনেমাটির জালাটার চারিদিক প্রদক্ষিণ করে আসছে আটপল এক বিপলের মধ্যে। পলকে পলকে এখানকার সব জিনিসই নতুন নতুন ভাব নিয়ে দেখা দিচ্ছে নতুন আলোতে। ... একটুকু জায়গা, এখানে কী যে সুন্দর নয় তা তো আমি জানি নে।''[১৬]

এই ভাবে আমরা দেখতে পাই অবনীন্দ্রনাথ তাঁর কলমের আঁচড়ে 'আলোর ফুলকি' তে যে ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন, তার মধ্যে এসেছে নানা লোক উপাদানের বিষয়।

অবনীন্দ্রনাথ তাঁর 'বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী' প্রবন্ধের 'ঘেলার পুতুল' অংশে মানব শিশু সম্পর্কে বলতে গিয়ে গ্রামের চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন —

''খেলুড়ির রাজা হল মানব শিশু। নটরাজ সে, নিজে নাচে বিশ্বকে নাচায়। বিশ্বরাজের লীলা সহচর রূপ সমস্ত চন্দ্র-সূর্য, জীব-জন্তু, ফুল-পাতা, মেঘ-বৃষ্টি — তারা সবাই এই খেলুড়ির রাজা মানব শিশুকে চিনলে, ঘিরে ঘিরে - বললে তাকে — 'হাসি কাঁদি যেমন নাচাও তেমনি নাচি।' মায়ের কোলে ধরা সেই মাটির ঘরের খেলুড়ি ছেলে মেয়ে দুটিতে ভোলে খেলনা পেয়ে। ফেলনা জিনিস দিয়ে তৈরী হল না সে সমস্ত খেলাঘরের হেলাফেলার পুতুল, যে মাটিতে ভূমিষ্ঠ হয় প্রাণ, যে মাটিতে মাটি হয়ে মেশে প্রাণের পাত্র দেহ, সেই মাটিতে গড়া হল পুতুল খেলার পুতুল। মাটির ঘরের ধারেই বাইরের খেলাঘরখানি পাতা, সেখানে আতা গাছে তোতাপাখি উড়ে বসে ডাকে — এসো খোকা খেলি এসো। মা বলেন — যেও না খোকা। খোকা বলে — যাব! খেলতে কাঁদে খোকা, ভোলানো শক্ত তাকে, চাঁদমুখে রোদ লাগার ভয় দিয়ে। রোদও সে ডাকছে — গাছের পাতায় আলোর ফুলঝুরি জ্বালিয়ে আর মাটি দিয়ে নিকানো উঠোনের একটি ধারে আলো ছায়ার চাকাচাকা ফুল সাজিয়ে খেলবে এসো খোকা।''[১৭]

অবনীন্দ্রনাথ 'বুড়ো আংলা' তে রিদয় নামের একটি ছেলের গল্প শুনিয়েছেন। গণেশ ঠাকুরের শাপে হৃদয় এর যক্ হয় যাওয়া এবং সেই শাপ থেকে উদ্ধার পাবার জন্য গণেশ ঠাকুরের খোঁজে হৃদয়ের কৈলাশ যাত্রার কথা গোটা গল্প জুড়ে দেখানো হয়েছে। আর হৃদয়ের এই কৈলাস যাত্রার পথে অবনীন্দ্রনাথ যেন শস্য-শ্যামলা গোটা বাংলাদেশের ছবি আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন। অবনীন্দ্রনাথ রিদয়ের বাড়ির বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন —

''পাড়া-গাঁয়ের সব বাড়ি যেমন, রিদয়দের বাড়িও তেমনি ছিল — 'পুবে হাঁস, পশ্চিমে বাঁশ, উত্তরে বেড়ে, দক্ষিণে ছেড়ে!' ঘরের দাওয়া থেকে নেমেই একহাত অন্তর একখানা চৌকো টালি পাতা রয়েছে। এমনি নানা দিকে সোজা-বাঁকা, ভাঙা-আস্ত টালিগুলো মাটির উপরে পেতে রাস্তা হয়েছে পুকুর পাড়ে যাবার, গোয়ালে যাবার, হেঁসেলে ঢোকবার। বর্ষার সময় যখন জলে সব ডুবে যায়, তখন এই টালির উপর পা ফেলে চলে যাও, একটুও পায়ে জল লাগবে না। আবার যেখানে জল নাবার নালা, তার উপরে এপার-ওপার করবার জন্যে দুটুকরো নারকোল গাছের গুঁড়ি পাটাতন করে পাতা, পুলের মতো তার উপর দিয়ে সোজা চলে যাও।''[১৮]

বর্ষাকালীন গ্রামবাংলার এক নিখুঁত ছবি তুলে ধরেছেন এই অংশে। আদ্যন্ত শহুরে সভ্যতায় তিনি মানুষ হলেও মাটির সাথে তাঁর খুব গভীর যোগ ছিল।

যক হয়ে যাবার পর রিদয় পাখি, বেড়াল, গরু সকলের কাছে জানতে চাইল গণেশ ঠাকুর এর সন্ধান। কিন্তু কেউ তাকে সাহায্য করল না। সকলেই তাকে তাড়া দিল। আসলে মানুষ থাকা অবস্থায়

রিদয় তাদের খুব জ্বালাত, তাই এই রাগ। শেষে রিদয়ের খুব মন খারাপ হয়ে গেল। তার গ্রাম, মা, বাবা, ঘর-বাড়ি ছেড়ে তাকে সেই কৈলাসে যেতে হবে ভেবে খুব দুঃখ হল তার। হৃদয়ের চোখে তার বাড়ি আবার নতুন রূপে ধরা পড়ল —

''রিদয় তাদের বাড়ির দিকে চেয়ে দেখলো খড়ের চাল ছোটো ছোটো তিনখানি থাকবার ঘর; তার চেয়ে ছোটো রান্না ঘরখানি; তার চেয়ে ছোটো গোয়াল ঘর; ঢেঁকিশাল, ধানের মরাই আর একটুকু সেই পুকুর, তার চারিদিকে চারটিখানি শাক-সবজী। রিদয়দের বাড়ি নেহাত সামান্য রকমের, কিন্তু তা হলেও এই সামান্য জমিটুকু ক'খানি ঘর, হাঁস-পুকুর, বাঁশঝাড়, তেঁতুল গাছটি নিয়ে কী সুন্দরই ঠেকল! যেন একখানি ছবি! অথচ এই বাড়ি ছেড়ে কতবার রিদয় মনে করেছে পালাবে; আজ কিন্তু সেই বাড়ির দিক থেকে তার চোখ আর ফিরতে চায় না।

দিনটা আজ আমতলি গ্রামখানির উপর, তাদের এই ঘরখানির উপর কী আলোই ফেলেছে! চারিদিক ঝকঝক করছে, ঝুরঝুর করছে! পাখি গাইছে, ভোমরা উড়ছে, বাতাস ছুটছে, নদী চলছে কল-কল, কুল-কুল, ফুর-ফুর! চারিদিক আজ ঝলসে উঠেছে, কেবল মাঝে বসে রয়েছে রিদয় — একলাটি মুখ চুন করে।''[১৯]

তারপর রিদয় তার মা সুবচনী ব্রত করতে যে খোঁড়া হাঁস পুষে ছিলেন সে মানস সরোবর যাচ্ছে শুনে রিদয় তার সাথে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল কৈলাসে পৌঁছানোর আশায়। হাঁসের পিঠে চড়ে রিদয় একের পর এক স্থান অতিক্রম করে চলল। হাঁসের দল যখন সুন্দরবন ছাড়িয়ে বাঙলাদেশের বুকের উপর দিয়ে উড়ে চলল, আকাশ থেকে রিদয় ভাবল যেন পাঁচ রঙের ছক কাটা চমৎকার একখানি কাঁথা রোদে পাতা রয়েছে। রিদয় ভাবতে লাগল তারা কোনখানে এসে পৌঁছেছে —

''রিদয় ভাবছে — 'বাস রে! এত বড় খেলার ছক, রাবণের দাবা খেলা নাকি?' অমনি যেন তার কথার উত্তর দিয়ে হাঁসেরা হাঁক দিলে — 'খেত আর মাঠ, খেত আর মাঠ বাখরগন্‌জো!' তখন রিদয়ের চোখ ফুটল। সে বুঝলে সবুজ ছকগুলো ধান খেত - নতুন শিষে ভরে রয়েছে। হলদে ছকগুলো সরষে খেত - সোনার ফুলে ভরে গিয়েছে। মেটে ছকগুলো খালি জমি - এখনো সেখানে ফসল গজায়নি। রাঙা ছকগুলো শোন আর পাট। সবুজ পাড় দেওয়া মেটে মেটে ছকগুলো খালি জমির ধারে ধারে গাছের সার। মাঝে মাঝে বড়ো বড়ো সবুজ দাগগুলো সব বন। কোথাও সোনালি, কোথাও লাল, কোথাও ফিকে নীলের ধারে ঘন সবুজ ছককাটা ডোরাটানা জায়গাগুলো নদীর ধারে গ্রামগুলি — ঘর-ঘর, পাড়া-পাড়া ভাগ করা হয়েছে। কতকগুলো ছকের মাঝে ঘন সবুজ, ধারে ধারে খয়েরী রঙ - সেগুলো হচ্ছে আম-কাঁঠালের বাগান - মাটির পাঁচিল ঘেরা। নদী-নালা, খালগুলোর হিদয় দেখলে

যেন রুপোলি ডোরার নক্সা - আলোতে ঝিকঝিক করছে। নতুন ফল, নতুন পাতা যেন সবুজ মখমলের উপরে এখানে ওখানে কারচোপের কাজ। যতদূর চোখ চলে এমনি। আকাশ থেকে মাটি যেন শতরঞ্জি হয়ে গেছে, দেখে রিদয় মজা পেয়েছে; সে হাততালি দিয়ে যেমন বলেছে — 'বাঃ কি তামাশা!' অমনি হাঁসেরা যেন তাকে ধমকে বলে উঠল — 'সেরা দেশ - সোনার দেশ - সবুজ দেশ - ফলন্ত ফুলন্ত বাঙলা দেশ'।''[২০]

চিত্রকর ছিলেন বলেই হয়তো লেখাতেও এমন ছবির পর ছবি ফুটিয়ে তুলতে পারতেন। যা সকলের পক্ষে সম্ভবপর নয়। হাঁসের পিঠে চেপে রিদয় হিমালয়ে গিয়ে পৌঁছাল। সেখানে কিছুদিন তারা সবাই মিলে বিশ্রাম নিল। তারপর বুনোহাঁস চকা তাকে বলল এবারে তারা বাড়ি ফিরে যাবে। কিন্তু রিদয়ের বাড়ি ফিরে যেতে ইচ্ছে করল না। সে এখন তো আর মানুষ নেই, যক্ হয়ে গেছে। তাই বাড়ি গেলেও তার মা-বাবা হয়তো তাকে চিনতে পারবে না। তাই চকার কথায় সে উৎসাহ দেখাল না। চকাও অবাক হল রিদয়ের আচরণে। কিন্তু চকার মুখে পুনরায় বাড়ি যাওয়ার প্রসঙ্গ শুনে তার শুধুই মনে পড়তে লাগল ফেলে আসা গ্রাম, ঘরের কথা —

''সারাদিন ধরে, আজ তার কেবলি মনে পড়তে লাগল — আমতলির সেই ঘর ক'খানি, সেই তেঁতুলতলার ঘাট, তেপান্তর মাঠ, হাঁস-পুকুরের কাদা জল, তাতে শালুক ফুল, বাড়ির ধারে ঝুমকো লতার মাচা, তার উপরে দুগ্‌গা টুনটুনি পাখিটি, উঠোনের কোণে তুলসীমঞ্চটি, কালো মাটি লেপা ঘরের দেওয়াল তার উপরে মায়ের হাতে লেখা লক্ষ্মী পুজোর আলপনা, দড়ির আলনায় বাপের কোঁচানো চাদর, পুরোনো শোবার তক্তা তার উপরে শীলতলপাটি আর লাল ঝালর দেওয়া তালপাতার পাখাখানি। সব আজ পরিষ্কার যেন রিদয় চোখে দেখতে লাগল, আর থেকে থেকে মন তার ঘরে যেতে আকুলি-বিকুলি করতে থাকল।''[২১]

এই অংশেও আমরা লোকায়ত ভাবনার প্রকাশ দেখতে পাই। গৃহের সজ্জার মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে নানা লোক উপাদান। দড়ির আলনা, আলপনা, শীতলপাটি, তালপাতার পাখা ইত্যাদি।

'বাতাপি রাক্ষস' গল্পে লেখক ইম্বল ও বাতাপি এই দুই রাক্ষস ভাইয়ের গল্প শুনিয়েছেন। মায়াবী রাক্ষস বাতাপি নেবু হয়ে গাছের তলায় পড়ে থাকত। সেই বনে দক্ষিণ দিকে ঋষিদের আশ্রম থেকে ঋষিকুমাররা বাতাপি নেবু পাড়তে আসত। আর তখন সেই বনে ভণ্ড তপস্বী সেজে থাকা ইম্বলের কথায় ঋষিকুমাররা গাছের তলায় পড়ে থাকা নেবু খেলে তারা একে একে মারা যেত। আর ঐ রাক্ষসরা তখন তাদের রক্ত পান করে সেই বনের মাটিতে পুঁতে রেখে দিত। তারপর একদিন অগস্ত্য মুনি সেইখানে এসে এ সমস্ত কিছু বুঝতে পারলেন এবং তাদেরকে উদ্ধার করলেন। অবনীন্দ্রনাথ সেই তপোবনের বর্ণনা দিতে গিয়ে সুন্দর ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন —

''এমন সময় একদিন রাক্ষসদের যম মহামুনি অগস্ত্য তীর্থ করে সেই দণ্ডক অরণ্যে এসে দেখলেন সেখানে সে তপোবন নাই, সে ঋষিরাও নাই, সেই শান্তশিষ্ট ঋষিকুমার — তারাও নাই। পাতার কুটির ভেঙে পড়েছে, মাটির ঘরে ফাট ধরেছে। ধানের ক্ষেত, কুশের বন, ফুলের বাগান কাঁটা গাছে ছেয়ে ফেলেছে। তপোবন যেন শ্মশান হয়েছে। এমন তপোবন কে এমন করেছে? মহামুনি অগস্ত্য সেই কাঁটার বনে ধ্যানে বসলেন। ঋষিদের কথা, ঋষিকুমারদের কথা, সেই দুই রক্ষাসদের কথা সব জানতে পারলেন।''[২২]

অবনীন্দ্রনাথ পরশুরামের 'জাবালি' গল্পকে 'ঋষি যাত্রা'য় রূপ দিয়েছিলেন। এই গল্পেরই এক স্থানে তিনি সুন্দর ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন, যেখানে লোক উপাদানের দেখা মেলে।

''।। মূল গয়েন - দিশা।।
ঘরে আসে রে বৈদেশী বন্‌ধু
ঘরে আসে, আপন ঘর।
(গীত - তুড়িজুড়ির)

হারে শীতকালের বেলা চলতি ভেলা —
দেখতে দেখতে যায়,
আঁধার ঘনায় আসে বাটের মুড়ায়,
হারে, ওপারে রাম-রাজার বাড়ি,
এপারে আমার চারচালি।
নদীর চরে ঘরখানি সে —
চালে ছাওয়া খড়,
নিকানো চুকানো পরিপাটি আঙিনা পসর,
আম-কাঁঠালের ছায়ায় ভরা
কাদা মাটির ঘর।''[২৩]

'হার-জিত' গল্পে ছবিওয়ালা, কবিওয়ালা আর খবরওয়ালা — এই তিন চরিত্রের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে কাহিনী এগিয়ে গেছে। ছবিওয়ালা আর কবিওয়ালার চোখে যেখানে প্রকৃতির নানা দৃশ্য ছবির মতো হয়ে ধরা দেয়, সেখানে খবরওয়ালার চোখে ওসব কিছু ধরা পড়ে না। সে শুধু রাজ্যের খবর জোগাড় করতেই ব্যস্ত থাকে। এই গল্পেও তিনি ছবিওয়ালা ও কবিওয়ালার চোখ দিয়ে যে দৃশ্যের পর দৃশ্য ফুটিয়ে তুলেছেন, তা অনবদ্য। তিনি বর্ণনা দিচ্ছেন —

''ছবি চলে, কবি চলে মাঠের পথে সন্ধ্যার হাওয়ায় উড়ুনী উড়িয়ে। কবি গায় চাঁদনি রাতের গান, ছবি চুপ করে শোনে আর চায় মাঠের পারে — বাঁশঝাড়ের ফাঁক দিয়ে যেখানে চাঁদ উঠেছে। সেই সময় বন-গাঁয়ের ধারে মাদল বাজে, ডাক দেয় গাঁয়ে গাঁয়ে কালো ছেলে-মেয়েদের 'বাহা পরবে'। কবি বলে, ও কী শুনি! ছবি বলে, ও কী দেখি! দুজনে এগিয়ে যায় গাঁয়ের দিকে।

একদল কালো পুরুষ, একদল কালো মেয়ে সারাদিন মাঠে মাঠে রোদ পিঠ পুড়িয়ে এখন চাঁদনীতে উৎসব করতে বেরিয়েছে — কেউ সেজেছে ফুলে ফুলে, কেউ সেজেছে পাখির পালকে, খোঁপায় সরু ধানের ঝুড়ি, গলায় কারু পুঁতির মালা, পরনে নতুন শাড়ি, ধোয়া কাপড়। গাছের তলায় ছাওয়া, সেখানে দাঁড়িয়ে মেয়েরা। মাঠের মাঝে চাঁদের আলো, সেখানে দাঁড়িয়ে পুরুষেরা। কবি ছবি দুটিকে দূর থেকে দেখছে।

মাদল ডাকে, পরব শুরু। যেন বাদলের মেঘ ডেকে গেল বকের পাঁতিকে। মেয়েরা শুনেও যেন শোনে না, গল্পই করে ছাওয়ায় দাঁড়িয়ে। বল্লমের আগায় চামর দুলিয়ে দূত এগিয়ে, জানায় সংবাদ - খবরের কাগজ তো নেই এদের। মাদল বাজে থৈয়া থৈয়া, হাতের নোয়া বাজে ঝিনি ঝিনি, মেয়েরা এগিয়ে আসে চাঁদনি জ্বালা আসরে। নাচ শুরু হয়। কবি শোনেন, ছবি দেখেন, দেখে লিখে চলেন —

দিনকে দিনে
দিনকে দিনে
চান্নি রাতের
শামনি ছাওয়া
বাড়তে চলে।
দেখতে শোভা
মন লোভা
দিচ্ছে আভা
মেঘের পারে।''[২৪]

'কোট্‌রা' গল্পে অবনীন্দ্রনাথ মাচারু ও তার স্ত্রী জুমনীর কঠোর জীবন সংগ্রামের কথা শুনিয়েছেন। মাচারুর নৌকোর নাম কোট্‌রা। এই নৌকাতে করে সারা বছর কাঠের ব্যবসা করে তার কষ্টে সংসার চলে। ছৈ-ঢাকা নৌকোর ভিতরে ছেলে-মেয়েদের নিয়ে তার সংসার পাতা। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর অনেক রচনায় লোকযান নৌকার বহুল পরিমানে ব্যবহার করেছেন। ঘুরে ফিরে এসেছে এই

লোকযানটির কথা। সেই নৌকোতে মাল সাজিয়ে মাচারু চলেছে সুন্দরবনের দিকে। নদীর দুই ধারে ধরা পড়েছে গ্রামের সুন্দর ছবি —

''ছুপ্ ছুপ্ করে জল কেটে ভরা পালে কোটরা চলেছে - নোটোকে নিয়ে শহর ছাড়িয়ে, পাড়া-গাঁয়ের মধ্য দিয়ে সুন্দরবনের দিকে। দু'ধারে খড়ের চালা, সবুজ মাঠ, তরকারির ক্ষেত, নিঝুম বন, নীল আকাশ জলে ছায়া ফেলছে, ঘাটে ঘাটে মেয়েরা নাইতে নেমেছে, খালে বিলে জেলে ডিঙ্গি জাল ফেলে চুপটি করে আছে। মাচারু হাল ধরে বসে রয়েছে — ঘাটে ঘাটে শুঁড়িখানার দিকে চেয়েও দেখছে না। নৌকোটা এতবার এই সব ঘাটে-ঘাটে শুঁড়িখানার কাছে ভিড়েছে যে আজও যেন সেই দিকেই এক-একবার সে নাকটা ফেরাচ্ছে, আর অমনি মাচারু তার উল্টোদিকে হালে মোচড় দিচ্ছে।''[২৫]

তারপর তাদের নৌকো নানা স্থান পেরিয়ে আশাশূন্যির ঘাটে এসে পৌঁছল। তখন শীতকাল, নদীতে চড়া পড়ায় নৌকো নিয়ে তারা সেখানেই বাসা বাঁধল। সেখানে পৌঁছে জুমনীর আবার একটি মেয়ে হল। তিনটি ছিল, হল চারটি। স্বভাবতই থাকা ও খাওয়ার সমস্যা আরো বেড়েই চলল। এর সাথে মাচারু আবার নোটো নামে রাস্তা থেকে এক ছেলেকে বাড়িতে নিয়ে আসে। সব মিলিয়ে সংসারে অভাব-অনটন লেগে থাকলেও সে সব তারা হাসি মুখে মেনে নেয়। এখানে এসে জুমনী নোটো আর তার মেয়ে লছমীকে মাস্টারশমায়ের কাছে পড়াশোনার জন্য ভর্তি করে দেয়। দুই ভাই-বোন রাস্তার দু'ধারে নানা দৃশ্য দেখতে দেখতে পাঠশালায় চলে —

''জুমনী নোটোকে আর লছমিকে মাস্টারবাবুর কাছে লেখাপড়া শিখতে দিলে। দুই ভাই-বোনের মতো দুটিকে ঘাটের সরু রাস্তাটি দিয়ে রোজ সকালে আঁচলে মুড়ি আর হাতে সেলেট বই দিয়ে পাঠশালে পাঠিয়ে দেয়। এই রাস্তাটুকুর মধ্যে নোটোর চোখে কত জিনিস পড়ে। ভাই-বোনে কত খেলাই হয়। খানার ধারে, করঞ্জা গাছে কোথায় একটা পাখি বাসা বেঁধেছে, সাঁকোর ধারে কোথায় ব্যাঙগুলো মস্ত একটা ছাতার করাখানা খুলে বসেছে, রাস্তার ধারে কোন পুকুরটায় একাট বোয়াল মাছ তুড়ি দিলেই কাছে আসে, কোন তেঁতুলগাছে বাদুড় সব নীচের দিকে ঝুলছে, কোন বনের ধারে বেতগাছ আছে যার খুব ভালো ছিপ হয়, কোথায় কুমোরের চাকা ঘুরছে আর তা থেকে হাঁড়ি-কুঁজো সব হঠাৎ বেরিয়ে আসছে, কোন ফাটা দেওয়ালের উপর একটা বহুরূপী রোদ পোহায়, আর মিনিটে দশরকম রং বদালয়, কাঁঠাল গাছের কোন কোটরে কাঠবেড়ালী দুটো ছানা দিয়েছে — সব নোটোর জানা আছে। ... পাঠশাল থেকে ফেরবার সময় দুটিতে বনের মধ্য দিয়ে ঘুরে আসত। সেখানে কাঠুরেরা বড়ো-বড়ো গাছ পাড়ছে, দেখেই গাছের আগ-ডালে দড়ি বাঁধতে নোটো সরসর করে গাছে উঠে যেত। আর নীচে দাঁড়িয়ে লছমি চেঁচাত - 'সিয়ারে সিয়ারে!' এমনি করে একবার নোটোকে

পাঠশালে পৌঁছে দিয়ে আবার দেশ-বিদেশে টেনে নিয়ে দু-বছর নৌকো এল আর গেল বাঁশের ছৈ-ঢাকা কোট্‌রায় দু'বছর থেকে নোটো আট বছরে পা দিলে।''[২৬]

আমরা আগেই বলেছি ঠাকুর বাড়ি শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি সবেই অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। তারা সামিল হয়েছে সামাজিক বিভিন্ন কাজকর্মে। দেশের মানুষ, দেশীয় সংস্কৃতির প্রতি তাঁদের ছিল স্বাভাবিক অনুরাগ। রবীন্দ্রনাথ নানা সামাজিক সেবায় যেমন নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন, তেমনি দেশীয় সাহিত্য-সংস্কৃতি নিয়েও তিনি কৌতূহলী ছিলেন। তিনি নিজে ছড়া সংগ্রহ করেছেন, অপরকে এই কাজে উৎসাহ দান করেছেন। বাউলগান নিয়ে তাঁর আগ্রহ ছিল চোখে পড়ার মতো। দেশের মানুষকেও তিনি এই কর্মযজ্ঞে সামিল হতে উৎসাহ জুগিয়েছেন। এই বংশেরই সন্তান অবনীন্দ্রনাথ। তিনি মানুষ হয়েছেন ঠাকুর বাড়ির এই জলহাওয়ার মধ্যে। তাই তাঁর মধ্যেও দেশীয় শিল্প ও সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ থাকা স্বাভাবিক। তিনিও 'রবিকা'-র মতো কিছু ছড়া সংগ্রহ করেছিলেন, যা 'ভারতী' পত্রিকায় ১৩৩০ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। লোকসাহিত্য ও লোক সংস্কৃতির প্রতিও ছিল তাঁর গভীর অনুরাগ। যার প্রমাণ আমরা তাঁর সাহিত্যের বিভিন্ন অংশে পেয়ে থাকি। আর তাই যখন তিনি সাহিত্যে কলমের দ্বারা ছবি ফুটিয়ে তোলেন, সেখানে লোকায়ত চেতনার প্রভাব স্বাভাবিক ভাবেই এসে পড়ে।

—০—

তথ্যসূত্র

১) রাজকাহিনী, অবনীন্দ্র রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, অক্টোবর ১৯৭৪, পৃঃ ১৫১।

২) তদেব, পৃঃ ১৬২।

৩) ভূতপত্রীর দেশ, অবনীন্দ্র রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, অক্টোবর ১৯৭৪, পৃঃ ১৯৫।

৪) নালক, অবনীন্দ্র রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, অক্টোবর ১৯৭৪, পৃঃ ২৩৩।

৫) তদেব, পৃঃ ২৪৩।

৬) তদেব, পৃঃ ২৪৪-২৪৫।

৭) তদেব, পৃঃ ২৪৯।

৮) তদেব, পৃঃ ২৫৪-২৫৫।

৯) তদেব, পৃঃ ২৬১।

১০) পথে বিপথে, অবনীন্দ্র রচনাবলী (চতুর্থ খণ্ড), প্রকাশ ভবন, জুন ১৯৭৯, পৃঃ ৮৫।

১১) ঠাকুর অবনীন্দ্রনাথ, খুদ্দুর যাত্রা, প্রতিক্ষণ, শ্রাবণ ১৪১৬ পৃঃ ৫৫।

১২) তদেব, পৃঃ ৫৯।

১৩) তদেব, পৃঃ ১৪০।

১৪) আলোর ফুলকি, অবনীন্দ্র রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, সেপ্টেম্বর ১৯৭৬, পৃঃ ১২।

১৫) তদেব, পৃঃ ২০।

১৬) তদেব, পৃঃ ২১-২২।

১৭) বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী, অবনীন্দ্র রচনাবলী (অষ্টম খণ্ড), প্রকাশ ভবন, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৭, পৃঃ ৩২৭।

১৮) বুড়ো আংলা, অবনীন্দ্র রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, সেপ্টেম্বর ১৯৭৬, পৃঃ ১৪৩।

১৯) তদেব, পৃঃ ১৪৬-১৪৭।

২০) তদেব, পৃঃ ১৫৪।

২১) তদেব, পৃঃ ২৪৫-২৪৬।

২২) বাতাপি রাক্ষস, অবনীন্দ্র রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, অক্টোবর ১৯৭৪, পৃঃ ৩২৪।

২৩) ঋষিযাত্রা, অবনীন্দ্র রচনাবলী (ষষ্ঠ খণ্ড), প্রকাশ ভবন, এপ্রিল ১৯৯১, পৃঃ ১৬১-১৬২।

২৪) হার জিত, অবনীন্দ্র রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, সেপ্টেম্বর ১৯৭৬, পৃঃ ৪২৩-৪২৪।

২৫) কোট্‌রা, অবনীন্দ্র রচনাবলী (চতুর্থ খণ্ড), প্রকাশ ভবন, জুন ১৯৭৯, পৃঃ ১৭৮।

২৬) তদেব, পৃঃ ১৮১-১৮২।

—০—